দ্বিতীয় ভাগ।

বঙ্গের আদিকবি পরম মহানুভাব

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের

জীবনী।

শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী—ভট্টাচার্য্য-

প্রণীত।

"চৈতন্য মঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ড যবন।
সেই মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা।)

কলিকাতা।

পটলডাঙ্গাস্থ রমানাথ মজুমদারের লেন, ৩নং ভবনে সাম্যযন্ত্রে
মুদ্রিত এবং ঘেনুড় দরিদ্র-বান্ধব পুস্তকালয় হইতে
শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, কর্ত্তৃক-
প্রকাশিত।

[সন ১২৯৪ সাল।]

সজ্জন-কুল-পঙ্কজ-রবি
পরম-ভক্তি-বিনোদ

কাই-গ্রাম-নিবাসী

বিদ্যানুরাগী ভূস্বামী শ্রীযুক্ত বাবু

বৃন্দাবনবিহারী বসু মুন্সী

মহাশয় করকমলেষু।—

মহাশয়,

বিগত ২১এ বৈশাখ শ্রীবৃন্দাবনদাস্ ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শনকালে বঙ্গের আদিকবি 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থ-রচয়িতা বেদব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুর মহানুভাবের বিবরণ শ্রবণ করিয়া আপনি বলিয়াছিলেন "বাঙ্গালীর বিশেষ কলঙ্কের কথা যে, আজও আমরা বঙ্গের আদি কবিকে জানি না।" সেইজন্য দেনুড় দরিদ্র-বান্ধব পুস্তকালয়ে সংগৃহীত জীবনীগুলির মধ্যে বঙ্গের আদি কবি ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের পবিত্র জীবনী মহাশয়কে উপহার প্রদান করিলাম। ইংলণ্ডে চসার কবির যেমন সমাদর আছে, ভরসা করি এই জীবনী পাঠে ঠাকুর বৃন্দাবনদাসেরও সেইমত সমাদর করিয়া বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করিবেন।

বর্দ্ধমান।
দেনুড় দরিদ্র-বান্ধব
পুস্তকালয়।
১২৯৪।৫ই শ্রাবণ।

একান্ত অনুগত,
শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য।

১২৯২ সালের সজ্জন-তোষণীতে বৃন্দাবনদাসের জীবনী সম্বন্ধে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এইস্থলে সন্নিবেশিত হইল।—

"দেনুড় গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের জীবন-চরিত সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। যদিও তিনি এই প্রবন্ধটী শীঘ্র শীঘ্র পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি যে কিছু সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে পাঠকবর্গ বিশেষ তৃপ্ত হইবেন। জনশ্রুতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লুপ্ত-প্রায় গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায়, তাহা আপাততঃ পত্রিকায় সংগৃহীত হইলে, পরে মহানুভবগণের জীবন-চরিত প্রকৃষ্টরূপে লিখিত হইবে, এই আশায় আমরা বিশেষ আদরের সহিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী প্রকাশ করিলাম।"

ঠাকুর বৃন্দাবন দাস কেবল বৈষ্ণব জগতের রত্ন নন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের একটী অলঙ্কারস্বরূপ। ইংরাজী ভাষায় যেরূপ চসার নামক কবির সম্মান আছে, বঙ্গীয় ভাষায় ঠাকুর বৃন্দাবনদাসেরও তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত প্রস্তাবে ঠাকুর বৃন্দাবনের পূর্ব্বে আর কেহ বঙ্গভাষায় পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন নাই। অতএব ব্রহ্মচারী মহাশয় বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের জীবনী সংগ্রহ করিয়া যেমত বৈষ্ণব সমাজকে তৃপ্ত করিলেন, তদ্রূপ সাহিত্য জগতের বিশেষ উপকার করিলেন।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
দেনুড়, দরিদ্র-বান্ধব-পুস্তকালয়।

গ্রন্থকারের পত্রাষ্টক কাব্যের সমালোচনা।

কবিতাকুসুম-প্রণেতা শ্রীযুক্তবাবু রামজয় বাগছী।

বোয়ালিয়া. ৮ই ফাল্গুন, ১২৯২।

আপনার পত্রাষ্টক কাব্যখানি পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতি পাইলাম। মনুষ্য-মনপ্রসূত কিছুই দোষশূন্য নহে, সুতরাং এ কাব্যখানিও দোষশূন্য হইতে পারে নাই। কিন্তু দোষের অংশ অপেক্ষা গুণের অংশ ইহাতে সমধিক দৃষ্ট হয়, সেই গুণ-গ্রামের জন্যই পত্রাষ্টক কাব্যখানি সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের নিকট একখানি উপাদেয় গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। সংসারের কঠোর কর্ত্তব্যগুলি সংশোধন করিয়া দৈনন্দিন অবকাশভাগ বিশুদ্ধ আমোদে কাটাইবার জন্য সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই ইচ্ছা বলবতী। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অল্পসংখ্যক উপায়ের মধ্যে বিশুদ্ধ কাব্যপাঠ একটী। পত্রাষ্টক কাব্যখানিকে আমি এই শ্রেণীর কাব্য মধ্যে গণ্য করি যে, আটটী পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে আটখানি পত্র রচিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীই ভাবুক ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণে সমর্থ; কবি সহজ কল্পনালঙ্কারে সেই ঘটনাবলীকে আরও চিত্তাকর্ষক করিতে সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে "মধুর বৃন্দাবন" যেরূপ শ্রীবিহীন রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহার বর্ণনাপাঠকালে বোধ হয় যেন স্বচক্ষে সেই ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। সাধ্য ও সাধকের মাখামাখি ভাবই সাধকের যে চরম ও পরম আনন্দ এবং কোনও অপরিহার্য্য ঘটনাসূত্রে সেই ভাবের শিথিলতায় সাধক-হৃদয়ের কি যেন কি হারাধন পুনঃ পাইবার আশায় যে উন্মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়,

আমাদের আদর্শসাধ্য সাধকের সেই ভাব, সেই অবস্থা, কবি শ্রীরাধিকার পত্রচ্ছলে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সীতার পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বাল্মিকীর সীতা পাতিব্রত্যের মূর্ত্তিমতী অবতারস্বরূপা। কবিও একখানি ক্ষুদ্র পত্রচ্ছলে সেই বৃহৎ ভাব সুন্দররূপে রক্ষা করিয়াছেন। পতিবিরহে পতিপ্রাণা জানকী জীবন ত্যাগ করিতে পারেন নাই।—

"তব নামসুধাপানে পূর্ব্বে বাঁচিয়াছি
* * * হইতে * * * "
নতুবা দুঃখের নাম যায় ভব হ'তে। পর্য্যন্ত

কবির এই অভিনব কল্পনাটী কি সুন্দর! কি মধুর! কিন্তু এত মধুরত্বের মধ্যে—

"ইচ্ছা কি হে পুনঃ দারগ্রহণে তোমার"

এই একটু গরল প্রক্ষেপ বড়ই যেন হৃদয়ে বাজে। সীতার ন্যায় আদর্শসতীর মুখে পতির প্রতি এরূপ সন্দেহের বাক্যপ্রয়োগ—ভাল হয় নাই, আশা করি, পুনঃসংস্করণে এই পংক্তিটী উঠাইয়া দিবেন। অন্যান্য পত্রেও সুন্দর কবিত্ব আছে, সমস্ত বিশেষরূপে দেখাইতে গেলে পত্র দীর্ঘ হইবে। ফলতঃ সহৃদয় পাঠক অবকাশ সময়ে এই পুস্তকপাঠে আনন্দলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। রচনাও বেশ প্রাঞ্জল, অমিত্রাক্ষর ছন্দে এরূপ প্রাঞ্জল রচনা বিশেষ প্রশংসনীয়। এই কাব্যখানিকে কবিবর ৺ মাইকেল মধুসূদনের বীরাঙ্গনার কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া আদর করি। * * * *

শ্রীরামজয় বাগছী।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে তৎপ্রণীত "পত্রাষ্টক কাব্য" ও প্রথমভাগ "বঙ্গরত্ন" নামক দুইখানি পুস্তক অনুগ্রহপূর্ব্বক উপহার দিয়াছেন। প্রথমখানি পদ্যে, দ্বিতীয়খানি গদ্যে রচিত। পত্রাষ্টক কাব্যে ভাষার লালিত্য ও ভাবের বেশ সমাবেশ হইয়াছে. আজকাল সচরাচর যেরূপ রাশি রাশি অসার পুস্তক দেখা যায়, এখানি সে শ্রেণীর নহে। ইহা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

প্রথমভাগ "বঙ্গরত্নে" মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কবিরত্নের জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী মহাশয় ধর্ম্মমঙ্গল মহা-কাব্য-প্রণেতা ঘনরামের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া বাস্তবিক গুণ-গ্রাহিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে তিনি বিশেষ পরি-শ্রম করিয়া সারবস্তু সংকলন করিয়াছেন।

কলিকাতা,
বীণাযন্ত্র। } শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

পত্রাষ্টক কাব্যখানি বীরাঙ্গণার অনুকরণে লিখিত হই-য়াছে। লালিত্যগুণে ইহার রচনা অনেক স্থলেই মনোহারিণী হইয়াছে।

কলিকাতা,
৪৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
৯ই নবেম্বর, ১৮৮৭ } একান্ত বশম্বদ,
শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

সহচর, ৮ ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৪।

পত্রাষ্টক কাব্য, শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। * * * * কৃষ্ণের প্রতি রাধা, রামচন্দ্রের প্রতি সীতা, ভরতের প্রতি কেকয়ী, অর্জ্জুনের প্রতি সুভদ্রা, রাবণের প্রতি মন্দোদরী, শিবের প্রতি সতী, চৈতন্যের প্রতি শচীমাতা, বলিরাজের প্রতি বৃন্দাবলী, পত্রাষ্টকে এই আটখানি পত্রিকা কাব্যাকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রণয়িনীর পত্রে প্রেম, জননীর পত্রে স্নেহবাৎসল্য, ভালবাসার দুই ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাষ্টকে বীরাঙ্গণার তান, লয়, সুর, না থাকিলেও যে একবারেই শ্রোতার অরুচিকর হইবে, ইহা আমরা মনে করি না।

Babu Kali Kumar Dass, B. A.
Head Master,
Rajshye College,
Beauleah Novr. 26, 1885.

I have received your books * * * * I have not yet been able to go through the whole, but the portion I have read has pleased me. I am happy to find you the author of such excellent poems.

KALI KUMAR DAS.

বঙ্গ-রত্ন

দ্বিতীয়ভাগ।

(বঙ্গের আদিকবি পরম মহানুভব শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জীবনী।)

মাতঃ বঙ্গভূমি! আজ্ কি আনন্দের দিন! তোমার আদিকবি ঠাকুর বৃন্দাবন দাস মহানুভবের জীবনী সাদরে প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি; কিন্তু আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই নিরানন্দ ঘটিয়া উঠিল। যবন ভূপতিদিগের অধিকারকালে ভারতের যে প্রকার দুরবস্থা গিয়াছে তাহাতে তৎকালীন কোন হস্তলিপি গ্রন্থ বা জীবনচরিত পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ জীবনচরিত লেখা আমাদের পদ্ধতি ছিল না, তবে মহদ্ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত যাহা জনশ্রুতিতে পাওয়া যায়, এখন তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদের আলোচনা করা উচিত, কারণ কালসহকারে ঐ সকল জনশ্রুতিও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

বৈষ্ণব কবি শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর অদ্য আমাদের সম্মুখে; তিনি নিরুপাধিক কৃষ্ণভক্ত। বঙ্গবাসিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত ও মহর্ষি বেদব্যাসের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ।—

"দ্বাপরেতে যেঁহ জন হৈলা বেদব্যাস।
গৌরাঙ্গলীলায় তেঁহ বৃন্দাবন দাস॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।)

স্বরূপনির্ণয় গ্রন্থেও ইহার এইরূপ প্রমাণ আছে। যথা—

"নারায়ণী-সুত বলি বৃন্দাবন দাস।
শ্রীভাগবত কৈল তেঁহ বেদব্যাস॥"

তজ্জন্য তিনি আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন এবং ভক্তিভাজন হইযাছেন। তিনি যে সময়ে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন বঙ্গভাষা অলঙ্কারহীনা বালিকা, মাতামহী সংস্কৃত ও মাতা প্রাকৃত ভাষার পার্শ্বে মলিনাবস্থায় উপবিষ্টা, পরাক্রান্ত যবন ভাষার অধীনে মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে বাধ্য। এমন কি সেই সময় হইতে দেবভাষা সংস্কৃত মৃতপ্রায় হইয়াছেন। রাজভাষা (পারসী) তখন আদরের ধন। বঙ্গবাসীর মনোভাব প্রকাশের উপায়স্বরূপ হইয়াও বঙ্গভাষা তখন আদরের ধন ছিল না; কারণ মানুষের

(বিশেষতঃ পরাজিত জাতির) স্বভাবসিদ্ধ এই যে তাহারা উপজীবিকার পথস্বরূপ রাজকীয় ভাষার অনুসরণ করিয়া থাকে। যদিও এখন পর্য্যন্ত আমরা পরাজিত, তথাপি আমরা মাতৃভাষার আদর করিতে শিক্ষা পাইতেছি। সুতরাং বঙ্গভাষার আর সেরূপ দুরবস্থা নাই। উহা দিন দিন সুন্দরী ও মধুময়ী হইতেছে। ফল কথা বঙ্গভাষা এখন যেরূপ তখন সেরূপ ছিল না। তখন কেবল কতিপয় উন্নতমনা সংস্কৃতজ্ঞ সাধু ও কতিপয় খ্যাতিপথানুসারী ব্যক্তি উহাকে সমাদর করিতেন। কেহ সংস্কৃতবিদ্যাবলে কেহ বা বুদ্ধিবলে উহার অঙ্গে মনোনীত ভূষণ পরাইতেন; কিন্তু কোন ভাষার পূর্ণাবয়ব না হইলে তাহাকে কিরূপে সুন্দর বলা যাইতে পারে? তখন বঙ্গভাষার সমস্ত অবয়ব পূর্ণ হয় নাই। কারণ উহার ব্যাকরণ বা গদ্যগ্রন্থ ছিল না, কিন্তু সুবুদ্ধি কবিগণ সচেষ্ট হইয়া প্রতিভাবলে স্থানে স্থানে প্রচলিত শব্দ দ্বারা স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার সময় কোন কোন স্থলে উহাকে পরিপাটীরূপে রচনা করিয়াছেন। যে কালে বঙ্গভাষার অবস্থা ঐরূপ, যে কালে বঙ্গভাষা পাঠশালায় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অন্তরে অশুদ্ধভাবে গঠিত হইয়া বিরাজিত, তখন (শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে) শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার নিজ কুটীরে

বসিয়া ধর্ম্মচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষার উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহার সমুদায় গ্রন্থ বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রকাশক, তাঁহার গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্রলীলা ও ভক্তিপ্রসঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বঙ্গে শ্রীচৈতন্য-প্রোথিত বৈষ্ণবধর্ম্ম-বীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্য যে যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সকলের রচনা অতিশয় সুমধুর ও কবিত্বপূর্ণ।

যত প্রকার বাঙ্গালা গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সত্য বটে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস ইহাঁর অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ ও গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ইহাঁদের গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন যথা——

"চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দসনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।)

এই সকল বৈষ্ণব কবিগণ গীতিকাব্য-লেখক ও তাঁহাদের কবিতা ব্রজভাষামিশ্রিত, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা নহে। আমরা তাঁহাদিগকে গাস্ত কবি-শ্রেণীভুক্ত

করিলাম। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস যেরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, আমাদের সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র। যদি সত্যপক্ষে বলিতে হয়, তবে এইরূপ বলিব, ঠাকুর বৃন্দাবনকে প্রায় বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থরচনা করিতে হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার ভাষার যে বিশেষ পারিপাট্য থাকিবে না, তাহাতে বিচিত্রতা কি? কিন্তু তাঁহার মধুময় কবিত্বে কে না মুগ্ধ হয়েন?

১৪০৭ শকে শ্রীনবদ্বীপ ধামে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং আনুমানিক ১৪২৫ শকে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিতের আলয়ে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রভু নিত্যানন্দের সন্ন্যাসীবেশ দেখিয়া নবদ্বীপবাসী সকলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। ঐ সকল লোকের মধ্যে শ্রীবাস ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীনিবাস আচার্য্যের নারায়ণী নাম্নী ৯।১০ বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা ছিল। নিত্যানন্দ প্রভু অপরাপর লোকের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নারায়ণীকে পুত্রবর প্রদান করিলেন। নারায়ণী অতিশয় লজ্জান্বিতা হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলিয়াছিলেন, "প্রভো! বিধাতার অকৃপায় আমি বিধবা, আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া বিধবাকে এরূপ নিদারুণ বর প্রদান করিলেন কেন?"

তদুত্তরে নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়াছিলেন, "আমার আজ্ঞা কখনই অন্যথা হইবার নহে। মহাপ্রভুর তাম্বূলের চর্ব্বিতাবশিষ্ট ভক্ষণ করিয়া তোমার গর্ভ হইবে, তজ্জন্য কেহ কলঙ্কারোপ করিতে পারিবে না, তোমার গর্ভে বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিবেন, তদনুসারে কিছুদিন পরে নারায়ণীর গর্ভ প্রকাশ হইল।

তাম্বূলের চর্ব্বিতাবশিষ্ট ভক্ষণ সম্বন্ধে বৃন্দাবন তাঁহার গ্রন্থে এইমত লিখিয়াছেন।—

"আপন গলার মালা দিল সভাকারে।
চর্ব্বিত তাম্বূল আজ্ঞা হইল সভারে॥
মহানন্দে খায় সভে হরষিত হৈঞা।
কোটী চন্দ্র শারদ মুখের দ্রব্য পাঞা॥
ভোজনের অবশেষে যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দান॥
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তারে করে আশীর্ব্বাদ॥
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
বালিকাস্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥

খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয় নারায়ণী।
কৃষ্ণের পরমানন্দে কাঁদ দেখি তুমি॥
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞায় প্রভাব।
কৃষ্ণ বলি কাঁদে অতি বালিকাস্বভাব॥
অদ্যাপিও বৈষ্ণবমণ্ডলে যার ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ-পাত্রী নারায়ণী॥"

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্য খণ্ড।)

"মাধ্যখণ্ডে চৈতন্যের অবশেষ পাত্র।
ব্রহ্মার দুর্লভ নারায়ণী পাইল মাত্র॥"

ঠাকুর বৃন্দাবন নারায়ণীর গর্ভজাত পুত্র, তাহার প্রমাণঃ—

"সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্রে নারায়ণীর গর্ভজাত॥"

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত অন্ত খণ্ড।)

শ্রীচৈতন্যদেবের তাম্বুলের অবশিষ্ট ভক্ষণে বৃন্দাবন দাসের জন্ম বলিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অনেক স্থলে শচী মাতাকে বৃন্দাবন আই বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন যথা—

"শ্যাম শুক্লরূপ দেখিলেন শচী-আই"।
"যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস হইতে আইর উপবাস॥"

ইত্যাদি।

বৃন্দাবন দাসের জীবনী সম্বন্ধে পাঠকগণকে এরূপ অনেক অদ্ভুত কথা শুনিতে হইবে। আধুনিক লোকের মধ্যে অনেকে হয়ত আমাদের এই কথাকে উন্মত্তের জল্পনা বলিয়া স্থির করিবেন; কিন্তু যখন এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন সমস্তই সহ্য করিতে হইবে, অনুসন্ধানে এপর্য্যন্ত যাহা পাইয়াছি, তাহা লৌকিক বা অলৌকিক বিবেচনা না করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিব, ইহাতে স্বকপোল-কল্পিত কিছুই লিখিব না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জনশ্রুতিতে যাহা পাওয়া যায় তাহাই লইয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। নতুবা কালে এই সকল শ্রুতিও বিলুপ্ত হইবার সম্ভব এই সময়ে নবদ্বীপে কাজীর বিচার প্রচলিত ছিল। কাজী নারায়ণীর এই গর্ভসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে রাজদ্বারে আনয়নপূর্ব্বক দণ্ড দিবার উদ্যোগ করায় নারায়ণী ভয়ে নিত্যানন্দ প্রভুকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া কাজীকে ভৎর্সনা করিয়া কহিয়াছিলেন—"তুমি জান মায়ের গর্ভে ব্যাসদেব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; ইহা প্রত্যক্ষ করিতে চাহ?" এই কথা বলিতে বলিতে গর্ভ হইতে "হরিধ্বনি" হইল। কাজী ভীত হইয়া অবধূত নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শিবিকা দ্বারা নারা-

য়ণীকে শ্রীবাস ঠাকুরের আলয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

নারায়ণী নবদ্বীপে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়া স্বীয় মাতুলালয় কুমারহট্টে গমন করিয়াছিলেন, তথায় আনুমানিক ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হইয়াছিল। এরূপ কিম্বদন্তী বৃন্দাবন ১৮ মাস গর্ভে থাকিয়া ভূমিষ্ঠ হয়েন।

নারায়ণীর বৈধব্য দশায় যেদিন সন্তান হয়, সেদিন কুমারহট্টের সকল স্থানে লোকে "ছি ছি, হরি হরি" বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। ভক্তেরা বলেন নিন্দাচ্ছলে হরিনাম শুনিতে শুনিতে বৃন্দাবন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; বৃন্দাবন ক্রমশঃ শশি-কলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, লোকনিন্দাবাদে জননীর পুত্রস্নেহের ত্রুটী হয় নাই। নারায়ণী চৈতন্যের কৃপাপাত্রী ছিলেন, তিনি কাহাকেও ভয় বা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না, ক্রমে বৃন্দাবন এক বৎসরের শিশু হইয়া উঠিলেন, নারায়ণী নিন্দাবাদ হইতে অন্তরে থাকিয়া ভক্তিরসে মনোনিবিষ্ট করিবার বাসনায় কুমারহট্ট পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী মাউগাছী গ্রামে আসিয়া কিছুদিন দীনবেশে কালাতিপাত করেন, ঐ গ্রামে অদ্যাপিও নারায়ণী-

পাট নামে একটি পাট আছে। নারায়ণী মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপ যাইয়া মহাপ্রভুকে দেখিতেন এবং হরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। অনুসন্ধানে মাউ-গাছী গ্রামে এইমত জানা গিয়াছে, চৈতন্যদেব সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করার কিছু দিবস পুর্ব্বে মাউগাছী গ্রামে আসিয়া সারঙ্গমুরারী ও বাসুদেব দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বাসুদেবকে সঙ্গে লইয়া যাইবার সময় নারায়ণীকে বাসুদেবের বিগ্রহ সেবার ভারার্পণ করিয়া-ছিলেন। তদবধি নারায়ণী মাউগাছীতেই বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু যে রাত্রে মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন, সে দিবস নারায়ণী মহাপ্রভুর আলয়ে উপস্থিত ছিলেন।

১৪৩১ শকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিবস ২৫ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্যদেব গৃহত্যাগ করিয়া কণ্টক নগরে (কাটোয়ায়) কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। যথা—

"চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস॥"
(চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড।)

তদনন্তর লীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, বৃন্দাবনধাম প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণাদি করিয়া ৬ বৎসর

কাল অতিবাহিত করেন। ১৪৪৩ কিম্বা ৪৪ শকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়ভক্তগণ সহ লীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তৎপ্রমাণ যথা—

"অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগদশা স্ফুরে নিরন্তর॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কাঁহা পাও কাঁহা যাও মুরলীবদন॥
রাত্রিদিন এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঞায় স্বরূপ রামানন্দ সনে॥
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সভে করিল গমন॥
নিত্যানন্দ প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্য গোঁসাই॥"

এই সঙ্গে ঠাকুর বৃন্দাবন দাসও মহাপ্রভুর দর্শনলাভ বাসনায় গমন করিতেছিলেন এবং নবদ্বীপ হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে দেনুড় গ্রামে আসিয়া স্নান ভোজনাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে নিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবন দাসকে মুখশুদ্ধির জন্য কিছু প্রার্থনা করায় বৃন্দাবন ঠাকুর একটী হরিতকী লইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে কহিয়াছিলেন, "গত কল্যের এইটী মাত্র মুখশু-

আছে"। নিত্যানন্দ প্রভু ইহা শ্রবণ করিয়া কহিয়াছিলেন, "তুমি সঞ্চয়ী (সন্ন্যাসধর্ম্মের উপযুক্ত এখনও হও নাই) অচিরাৎ আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এই গ্রামে থাকিয়া মহাপ্রভুর মূর্ত্তি প্রকাশ এবং লীলা বর্ণনা কর।" সেই আজ্ঞায় শ্রীচৈতন্য ভাগবত লিখিত হইয়াছে যথা—

"চৈতন্যের প্রিয় সেই নিত্যানন্দ রাম।
হউক মোর প্রাণনাথ এই মনস্কাম॥
তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যে সে মতি।
তাঁহার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্মৃতি॥"

(চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড।)

অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই হরিতকী দেনুড় গ্রামে সেইস্থানে প্রোথিত করিয়াছিলেন। উক্ত বীজ হইতে একটী বৃহৎ হরিতকী বৃক্ষ জন্মিয়াছিল; আক্ষেপের বিষয় বৃক্ষটী বাঙ্গালা ১২৬৬ সালে এক ব্যক্তি ছেদন করিয়াছে। এখনও ঐ স্থানকে "হরিতকী-তলার ডাঙ্গা" বলে।

নিত্যানন্দ প্রভুর এ প্রকার কঠিন আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবন ঠাকুর অনেকরূপ মিনতি করিয়াছিলেন; কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। অবশেষে লীলাচলে মহাপ্রভু চৈতন্য-

দেব, জগন্নাথ, বৃন্দাবনধামে রাধাগোবিন্দ, দ্বাদশ গোপালের পাট; ইত্যাদি পবিত্র স্থান দর্শনবাসনা করিয়া তাঁহার সহিত গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য-দেব জগন্নাথ রাধাগোবিন্দজী, ও দ্বাদশ গোপালের পাটের দেবমূর্ত্তিসমূহ ঐ গ্রামে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া বৃন্দাবনকে তথায় রাখিয়া নীলাচলাভিমুখে প্রস্থান করেন। ঐ সময়ে বৃন্দাবনের বয়স আনুমানিক পঞ্চদশ বৎসর। তদনুসারে বৃন্দাবন উল্লিখিত গ্রামে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, জগন্নাথ ও প্রোক্ত দেবমূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিত করেন, ঐ দেবমন্দির বৃন্দাবনের পাটনামে অদ্যাপি সুবিখ্যাত আছে। প্রতিবৎসর নানা স্থান হইতে অনেক যাত্রী ও ভক্ত দর্শনার্থে আসিয়া থাকেন, ঐ পাট দ্বাদশ পাটের অন্তর্গত নয়।

তাঁহার ঐ গ্রামে অধিষ্ঠানকালে রামহরি (কায়স্থ) শচী, দেবী ও গোপীনাথ (ব্রাহ্মণ) এই চারিজন ভক্ত ও সখা ছিলেন।

"প্রিয় ভক্ত রামহরি শচী দেবী আদি করি;
গোপীনাথে ধরি দেন কোল।"

এই কবিতার্দ্ধ মোহান্তদের নিকট শুনিয়াছি, কিন্তু

কি পুস্তক, বা কাহার রচিত পুস্তক হইতে বলেন তাহা কেহ বলিতে পারেন না। বোধ হয় ঠাকুর বৃন্দাবনের জীবনচরিত কোন গ্রন্থ ছিল, ঐ সময় পদ্যের সমূহ আদর ছিল তজ্জন্যই জীবনী পর্য্যন্ত পদ্যে লিখিত হইয়াছিল। আহা যদি ঐ গ্রন্থ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বৃন্দাবনের জীবনী আজ অন্ধকারে অনুসন্ধান করিতে হইত না, এ ভারতে, ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান সমস্তই ছিল, কেবল গোপন রাখা আর মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে আমরা সমস্তই হারাইয়াছি, এখনও অনেক বৈষ্ণবের নিকট অনেক গ্রন্থ আছে; কিন্তু তাঁহারা ঐ সকল জনসমাজে প্রকাশ করিতে দিবেন না। বলিলে বলেন ওসব প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে। এ কথার কোন অর্থই নাই, আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া ঠাকুর বৃন্দাবনের তিনখানি গ্রন্থ পাইয়াছি।

চৈতন্যদেব ১৪৫৫ শকে অপ্রকট হন; তাঁহার লীলাসম্বরণের অল্প দিবস পরেই শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অনুমান ১৪৫৭ কি ৫৯ শকে এই মহাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই সময় কবির বয়স ২৮।৩০ বৎসর অনুমিত। শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের নাম প্রথমতঃ "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" দিয়াছিলেন, তদনন্তর বর্দ্ধমান জেলার অধীন শ্রীখণ্ডের নিকট কো-গ্রাম-

নিবাসী লোচনানন্দ দাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার ইষ্টদেব ঠাকুর নরহরি সরকারকে উপহার প্রদান করেন। তদ্দর্শনে নরহরি ঠাকুর বলিয়াছিলেন, দেনুড়গ্রামনিবাসী ঠাকুর বৃন্দাবন দাস ইহার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; অতএব তোমার এ পুস্তক রচনা করা অকারণ হইয়াছে, তাঁহার গ্রন্থ এদেশে বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছে বোধ হয় তুমি তাহা অবগত নহ; এই বাক্য শুনিয়া লোচনানন্দ দাস গ্রন্থসহ দেনুড়ে উপস্থিত হইয়া বৃন্দাবন ঠাকুরকে গ্রন্থ দেখিতে অনুরোধ করেন। তিনি গ্রন্থ খুলিয়া দেখিলেন, চৈতন্যদেব যে দিবস সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহার পূর্ব্বরাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিহার বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—

"শয়ন আওয়াসে সুখে শয়ন করিলা।
তাম্বূল-তবক-করে বিষ্ণুপ্রিয়া গেলা॥
হাসিয়া সম্ভাষে প্রভু আইস আইস বলে।
পরম পিরীতে তাঁরে বসাইলা কোলে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু-অঙ্গে চন্দন লেপিল।
অগুরু কস্তুরি গন্ধে তিলক রচিল॥
দিব্য মালতীর মালা দিল প্রভু-অঙ্গে।
শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানা রঙ্গে॥

তবে মহাপ্রভু সে রসিক-শিরোমণি।
বিষ্ণুপ্রিয়া-অঙ্গে বেশ করেন আপনি॥
সুন্দর ললাটে সেই সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে করিয়াছে যেন ইন্দু॥
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দনবিন্দু আর।
শশি-কোলে সূর্য্য তারা ধায় দেখিবার॥
খঞ্জন-নয়নে দেয় অঞ্জনের রেখ।
কাম কামানের গুণ আগে পরতেক॥
অগুরুচন্দনগন্ধ কুচোপরে লেপে।
দিব্য বস্ত্রে গঠিল কাঁচলী পরতেকে॥
ত্রৈলোক্যমোহিনী বেশ নিরীখে বদন।
অধরমাধুরী রসে করয়ে চুম্বন॥ ইত্যাদি।
(লোচনকৃত চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড।)

কিন্তু বৃন্দাবনদাস এস্থলে বিহারবর্ণন করেন নাই, এজন্য বলিয়াছিলেন তুমি এস্থলে স্বাধীনভর্ত্তৃকা ভাব অর্থাৎ অদূরপ্রবাস বর্ণন করিয়াছ, কিন্তু এস্থলে প্রোষিতভর্ত্তৃকা (মাথুরের ভাব) বর্ণন করা উচিত ছিল। এই কথা শুনিয়া লোচনের বদন ম্লান হইল। এমত সময়ে ঠাকুর বৃন্দাবনের জননী মামগাছী হইতে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেনুড়ে আসিয়া, উপস্থিত বিষয় শুনিয়া লোচনের মত সমর্থন করিয়া

বলিয়াছিলেন, "মহাপ্রভু রজনীযোগে সন্ন্যাসযাত্রা করিবেন, জানিয়া আমি নিদ্রা না যাইয়া তাঁহার গমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। সেই সময় গৃহের বাহির হইতে তাঁহাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছিলাম। এইজন্যই আমি লোচনের মত সমর্থন করিতে সাহসী।" মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবন আর কোন উত্তর না করিয়া গ্রন্থের অপর এক পৃষ্ঠায়—

"অভিন্ন চৈতন্য মোর প্রভু অবধূত।"

এই কবিতার্দ্ধ পাঠ করতঃ বলিয়াছিলেন, লোচনানন্দ! তোমার এই গ্রন্থ অবশ্যই গৌড় দেশের লোকের শ্রবণ ও লোচনানন্দ হইবে। কারণ তুমি নিতাই গৌরকে অভিন্ন দেখিয়াছ, আমি এখনও তাহা দেখিতে পাই নাই। অদ্য হইতে আমার রচিত "চৈতন্যমঙ্গল" "শ্রীচৈতন্য ভাগবত" নাম ধারণ করিল। পাঠকগণ! দেখুন বৃন্দাবন কেমন উচ্চান্তঃকরণের লোক ছিলেন। তাঁহার যে গ্রন্থ জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে তাহার নূতন নামকরণ করিয়া নূতন লিখিত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের নাম স্থির রাখিলেন। লোচনদাসের গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বেও বৃন্দাবন ঠাকুরের গ্রন্থ রচনার পরে কাটোয়ার নিকট ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যকুল-সম্ভূত মধুরভাষী কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেন, কৃষ্ণদাস স্বীয়

গ্রন্থের মধ্যে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের যে যে স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা—

"চৈতন্যমঙ্গলে যাহা কহে বৃন্দাবন।"

ইত্যাদি।

লিখিয়াছেন, কারণ যখন চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়, তখন লোচন গ্রন্থ লেখেন নাই। সুতরাং বৃন্দা-বনের "শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের" নাম তখনও "শ্রীচৈতন্য ভাগবত" হয় নাই।

বৃন্দাবনের অধ্যয়ন সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; এখানকার মোহান্তেরা বলেন, "তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট শ্রুত হইয়াছেন বৃন্দাবন বেদব্যাসাবতার"। সুতরাং তাঁহার বিদ্যা দৈবলব্ধ, কোন পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই; এবং প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে বাগীশ্বরী তাঁহার কণ্ঠাসনে আসিয়াছিলেন, বৃন্দাবন ঠাকুর প্রভু নিত্যানন্দের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

তিনি যে ভাগবত গ্রন্থ দেখিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থখানি নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগদাধর পণ্ডিতের দ্বারা লিখাইয়া ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখাইয়া লইয়া বৃন্দাবনকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ঐ

তাড়িয়াৎ পত্রে * লিখিত গ্রন্থে চৈতন্য প্রভুর হস্ত-লিখিত টীকাসহ এখনও বৃন্দাবন ঠাকুরের দেব-মন্দিরে যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর যাত্রী ও ভক্ত-সমূহ আসিয়া শ্রীচৈতন্য গদাধরের যুগল হস্তাক্ষর এক গ্রন্থ মধ্যে দর্শন করেন। গ্রন্থখানি অতিশয় জীর্ণ হইয়াছে, এবং তুই একটী পত্রের কোন কোন অংশ নষ্টও হইয়াছে। তথাপি এখনও যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট। প্রায় ৪০০ বৎসরের গ্রন্থ রাখা বড় সহজ ব্যাপার নহে। নিত্যানন্দের নিকট বৃন্দাবনের ভাগবত অধ্যয়ন সম্বন্ধে বৃন্দাবন নিজ গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা—

"সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হন নিত্যানন্দ।
তাঁন হইয়া ভজি যেন প্রভু গৌর চন্দ্র॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মে জন্মে পড়িবাঁও এই অভিমত॥"

(চৈতন্য ভাগবত আদি খণ্ড) বৃন্দাবন নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন যথা—

"ইষ্টদেব বন্দ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥"

---

* বর্দ্ধমানের এই সকল গ্রামের মাঝে মাঝে তাল গাছের মত ঐ গাছ আছে।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা লোচনানন্দ দাস নরহরি ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন যথা—

"নরহরি দাস হয়ে ঠাকুর আমার।
এই সে ভরসা গুণ বল মো তোমার॥"

(লোচনকৃত চৈতন্যমঙ্গল।)

নরহরি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, লোচনানন্দ দাস তাঁহার শিষ্য এবং লোচনের গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে বৃন্দাবন ঠাকুর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং বৃন্দাবন শ্রীগৌরাঙ্গের সমকালের লোক, যাহা আমরা পুর্ব্বে প্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াশক নিরূপণ করিয়াছি। ইহাও তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৃন্দাবন ঠাকুর গৌর ও নিত্যানন্দ-চরিত্রে যাহা চিত্রিত করিয়াছেন তাহা সমস্তই সত্য; কল্পিত কাব্যরসে রঞ্জিত নহে ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। যদিও চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৃন্দাবন নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশক্রমে যাইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি তাঁহার পাটে বসিয়া প্রভুর লীলাচল ও অন্যান্য স্থানের লীলাসমূহ বিশ্বস্তসূত্রে শুনিতে পাইতেন সন্দেহ নাই।

শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুর চৈতন্যের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে চামর ব্যজন করিতেন।

একদা নরহরি ঠাকুর জনৈক বৈষ্ণব দ্বারা কাষ্ঠপাদুকা বহন করাইয়াছিলেন, তদ্দর্শনে ঠাকুর বৃন্দাবন নরহরির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় বৈষ্ণব-ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবের অপমান তাঁহার পক্ষে অসহনীয়; এইজন্য চৈতন্যের পারিষদ্ বর্ণনস্থলে নরহরি ঠাকুরের নামোল্লেখ না করিয়া গ্রন্থের অসম্পূর্ণ দোষ পরিহারার্থ বলিয়াছিলেন। যথা—

"কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।
কোন কোন ভাগ্যবান চামর ঢুলায়॥"

বৃন্দাবন ঠাকুর বিশেষ বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যথা ;—

"অভেদ দৃষ্টিতে সব বৈষ্ণব ভজিয়া।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে সে যায় তরিয়া॥
যে গায় যে শুনে এ সকল পুণ্যকথা। • •
বৈষ্ণবাপরাধ তার না জন্মে সর্ব্বথা॥"

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ড।)

এইস্থলে দেনুড় গ্রামের মোহান্তগণের অন্বয় গাফুলিয়ানিবাসী শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মোহান্ত বলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র জন্মগ্রহণ করিলে ঠাকুর বৃন্দাবন নিত্যানন্দ-চরিত সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে বলেন।—

"যে দেখে নাই গৌরচন্দ্র দেখুক আরবার।
পুনরপি বীরভদ্র গৌর অবতার ॥"

এই কথায় নরহরি ঠাকুর অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহাও একটী উভয়ের মনোমালিন্যের কারণ। এ বিষয় নরহরি ঠাকুরের জীবনে বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

বৃন্দাবন কত বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই। তাঁহার আবির্ভাবও যেমন তিরোভাবও তদ্রূপ, শুনা যায়। ভক্ত রামহরিকে সেবার ভারার্পণ করিয়া বৃন্দাবন-ধাম গমনপূর্ব্বক মানবলীলা সম্বরণ করেন। মতান্তরে জগন্নাথ ক্ষেত্রে বৃন্দাবন ঠাকুরের তনুত্যাগের কথা শুনা যায়। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদে বৃন্দাবন-দাসের তিরোভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐ দিবসে তাঁহার শ্রীপাটে একটী বিরহ-মহোৎসব হইত সম্প্রতি বন্ধ হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট হওয়ার কত দিবস পরে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর নরলীলা সম্বরণ করেন, তাহা স্থির করা অতিশয় কঠিন। শুনা যায়, শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের লীলাসম্বরণের পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত বৃন্দাবন ঠাকুরের অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন, যথা—

"বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥"

ইহার দ্বারা এইমাত্র স্থির হইতেছে যে, শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুর দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃত রচনার সময়ও তিনি জীবিত ছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাসের শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদক্ষিণ এবং তাঁহার যমুনা পুষ্করিণীর পশ্চিমে তাঁহার "হরিনাম" জপের সিদ্ধাসনস্থল।

কথিত আছে ঠাকুর বৃন্দাবনদাস পৌষ মাসে একদা সন্ধ্যার সময় তাঁহার সিদ্ধাসনে বসিয়া হরিনাম জপ করিতেছেন এমন সময় কতকগুলি বাউল আসিয়া তাঁহার নিকট অতিথিসৎকারের প্রার্থনা করিয়া ইলিস মৎস্য সঙ্গে কাঁচা আম্র রন্ধনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল। ঐ সময়ে আম্র ও ইলিস মৎস্য অতি-শয় দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কি অপার মহিমা, তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া বৃন্দাবন ঠাকুর দেবীকে উল্লিখিত যমুনা পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিতে এবং রাম-হরিকে ধরের পুষ্করিণীর পাহারের আম্রবাগান হইতে আম্র আনিতে আদেশ দিলেন; তাঁহারা আদেশমাত্র উভয়বিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়া বৃন্দাবনের

নিকট আদিষ্ট দ্রব্য আনিয়া দিলে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অবাধে ঐ সমস্ত অভ্যাগতে স্বেচ্ছাভোজ্য দানে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

কবি সংস্কৃত ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ছিলেন।

অতঃপর শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা দুই একটী কথা সংক্ষেপে বলিয়া এই জীবনী উপসংহার করিবার মানস করিয়াছি, কারণ শ্রীচৈতন্য ভাগবত একখানি বৃহৎ গ্রন্থ উহার বিশেষ সমালোচন করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভব নহে, আর এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের বেশী কথা বলিবারও নাই, কারণ ইহা বঙ্গ-ভাষার আদি গ্রন্থ, সুতরাং সকলেই ইহার বিশেষ আদর করেন, এবং ভক্ত বৈষ্ণবগণের যত্নের সামগ্রী ও বহু লোকের নিত্যপাঠ্য, একারণ সমালোচন দ্বারা ইহা বিশেষরূপ পরিচিত করিতে বাসনা করা নিতান্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় মাত্র।

এইহেতু এই গ্রন্থের সমালোচনে ক্ষান্ত থাকিয়া কেবল যথেচ্ছা কতিপয় পদ্য উদ্ধৃত করিলাম।

কবির বিশেষ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য ছিল তাহা তাঁহার গ্রন্থেই প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁহার ভাষা পুরাতন হইলেও অতিশয় বিশদ ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট, পাঠ করিবা-মাত্র সমস্ত ভাব উপলব্ধি হয়। করুণ, হাস্য, ভক্তিরস বর্ণনায় তিনি বিশেষ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহত্যাগকালে শচীমাতার নিকট বিদায়; করুণ রসের একটী উদাহরণস্থল, পাঠকালে বোধ হয় যেন সেই সমস্ত ঘটনা চক্ষে দেখিতেছি। শান্তিপুরে গৌরাঙ্গ আগমন শ্রবণে ভক্তগণের ও শচী-মাতার বিলাপ; করুণ রসের একটী উদাহরণস্থল, ইহা পাঠকালে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না ;—

"বাপ বাপ বলি আই হইলা মূর্চ্ছিত।
না জানি যে কেবা কান্দে পড়ে কোন ভিত॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সবা করি ক্রোড়ে।
সত্বরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে॥

চৈতন্য বিরহে জীর্ণ সর্ব্ব ভক্তগণ।
পূর্ণ হৈল শুনি নিত্যানন্দের বচন॥
উঠিল পরমানন্দে কৃষ্ণ কোলাহল।
সবেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল॥
যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস হইতে আইর উপবাস॥
দ্বাদশ উপাস তান নাহিক ভোজন।
চৈতন্যপ্রভাবে মাত্র আছয়ে জীবন॥"

(চৈতন্য ভাগবত, অন্তখণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা।)

বাহুল্যভয়ে দুই চারিটী কবিতা মাত্র তুলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

কবির গভীর ভাবের উদাহরণ ;—

"পক্ষী যৈছে আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে তত দূরে উড়ি যায়॥
এইমত চৈতন্যের কথার অন্ত নাই।
যার যত শক্তি সবে তত তত গাই॥"

(মধ্যখণ্ড শ্রীচৈতন্য ভাগবত।)

কবি ভৌগোলিক বিবরণে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহার প্রমাণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থভ্রমণ বিবরণ পাঠে জানা যায়, বাহুল্যভয়ে দুই চারি পংক্তি মাত্র উদাহরণ দিলাম।

"প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ বনে গেলা একেশ্বর॥
গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী।
যাঁহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তরবাহিনী॥
গঙ্গা দেখি বড় সুখী নিত্যানন্দ রায়।
স্নান করে পান করে আত্তি নাহি যায়॥
প্রয়াগে করিয়া মাঘ মাসে প্রাতঃ স্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্ব্ব জন্মস্থান॥"

ইত্যাদি।

ইহার রচনায় প্রাচীন ও আধুনিক অপ্রচলিত শব্দ অনেক ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং পয়ারের অক্ষরের ও মিলের যদিও সামঞ্জস্য নাই তথাপি ভাবের ব্যত্যয় বা ভাবার্থ উপলব্ধির ব্যাঘাত হয় না।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত ভিন্ন ইহাঁর তত্ত্বসার, ভক্তি চিন্তামণি, তত্ত্ববিলাস এবং পদাবলী আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। অবশেষে কবির একটী বিরল প্রচারিত গীত পাঠকগণকে উপহার দিলাম, অবশ্য বঙ্গের আদি কবির এই গীতটীতে সকলে মোহিত হইবেন সন্দেহ নাই। মরি কি মধুর ভাব! গীতটী এই ;—

ধানশ্রীরাগ।

অলসে অরুণ আঁখি কহ পহুঁ কিবা দেখি,
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে। • •
বদন-সরসীরুহ মলিন হইয়াছে,
হে রজনী করিয়া জাগরণে।
যাও গৌর তুয়া সনে কিসের পিরিতি।
এমন সোণার দেহ, পরশ করিল কেহ,
নাজানি সে কোন্ রসবতী।
নদীয়া নাগরী সনে, রসিয়া হয়েছ হে,
অবহুঁ * কি পার ছাড়িবারে।

---

* এখন।

সুরধুনী-তীরে যাইয়া, মার্জ্জন করগে হিয়া,
তবে সে আসিতে দিব ঘরে।
গৌরাঙ্গ করুণাভাষী, কহে মৃদু মৃদু হাসি,
কাহে প্রিয়ে কহ কটুভাষ।
হরিনামে জাগি নিশি, অমিয়-সাগরে ভাসি,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস।

শ্রীচৈতন্যদেব হরিনাম সংকীর্ত্তনে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করায় বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রভাতে শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনে বিষ্ণুপ্রিয়া নারী-স্বভাবসুলভ চাঞ্চল্যে অধীরা হইয়া তাঁহার প্রতি সন্দেহ বাক্য প্রয়োগে অভিমান প্রকাশ করেন।

বিমলচরিত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু "হরিনামে জাগি নিশি, 'অমিয়া সাগরে ভাসি" বলিয়া ভক্তিরসের অবতারণায় বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রোধ শান্তি করিলেন, এই বহুভাব কবি একটী ক্ষুদ্র গীত দ্বারা সুন্দররূপে বুঝাইয়া বিশেষ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। পাঠকগণ, 'হরিনামে জাগি নিশি, অমিয়-সাগরে ভাসি' এই কথা কয়টী কতদূর হৃদয়গ্রাহী এবং উন্নত-কবিত্বপূর্ণ!

সমাপ্ত।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গা রমানাথ মজুমদারের লেন, ৩নং ভবনে
সাম্য প্রেসে মুদ্রিত।